ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ -- জ্ঞানীর ধ্যান

ঠাকুর সেই দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন, -- কয়েকটি ভক্তসঙ্গে। ডাক্তার এবং প্রতাপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) -- আবার কাশি হয়েছে? (সহাস্যে) তা কশীতে যাওয়া তো ভাল। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- তাতে তো মুক্তি গো! আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই। (ডাক্তার ও ভক্তেরা হাসিতেছেন)

শ্রীযুক্ত প্রতাপ, ডাক্তার ভাদুড়ির জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে দেখিয়া ভাদুড়ীর গুণগান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে) -- আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন! ঈশ্বরচিন্তা, শুদ্ধাচার, আর নিরাকার-সাকার সব ভাব নিয়েছেন।

মাস্টারের বড় ইচ্ছা যে ইটপাটকেলের কথাটি আর একবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে -- অথচ ঠাকুর যাহাতে শুনিতে পান -- এমন ভাবে বলিতেছেন, “ইটপাটকেলের কথাটি ভাদুড়ী কি বলেছেন মনে আছে?”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি) -- আর তোমায় কি বলেছেন জানো? তুমি এ-সব বিশ্বাস কর না, মন্বন্তরের পর তোমার ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার (সহাস্যে) -- ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করে অনেক জন্মের পর যদি মানুষ হই, আবার এখানে এলেই তো ইটপাটকেল থেকে আবার আরম্ভ। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)

ঠাকুর একটু অসুস্থ, তবুও তাঁহার ঈশ্বরীয় ভাব হয় ও তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদা কন, এই কথা হইতেছে।

প্রতাপ -- কাল দেখে গেলাম ভাবাবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- সে আপনি আপনি হয়ে গিয়েছিল; বেশি নয়।

ডাক্তার -- কথা আর ভাব এখন ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) -- কাল যে ভাবাবস্থা হয়েছিল, তাতে তোমাকে দেখলাম। দেখলাম, জ্ঞানের আকার -- কিন্তু মজক একেবারে শুষ্ক, আনন্দরস পায় নাই। (প্রতাপের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) যদি একবার আনন্দ পান, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ দেখেন। আর ‘আমি যা বলছি তাই ঠিক, আর অন্যেরা যা বলে তা ঠিক নয়,’ -- এ-সব কথা তাহলে আর বলেন না -- আর হ্যাঁক-ম্যাঁক লাঠিমারা কথাগোলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না!

[*জীবনের উদ্দেশ্য -- পূর্বকথা -- ন্যাংটার উপদেশ*]

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ডাক্তার সরকারকে বলিতেছেন --

“মহীন্দ্রবাবু -- কি টাকা টাকা করছো! মাগ, মাগ! -- মান, মান! করছো! ও-সব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও! -- ওই আনন্দ ভোগ করো।”

ডাক্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন। সকলেই চুপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাংটা বলত। জলে জল, অধঃ ঊর্ধ্বে পরিপূর্ণ! জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে।

“অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে, -- অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। ‘আমি’ ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ওই ‘আমিটি’ যদি যায়, তাহলে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।

“জ্ঞানীর ধ্যান আর কিরকম জানো? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার করে। চিদাকাশ, আত্মা পাখি। পাখি খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না।”[১]

ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া এই ধ্যানযোগ কথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ (সরকারের প্রতি) -- ভাবতে গেলে সব ছায়া।

ডাক্তার -- ছায়া যদি বললে, তবে তিনটি চাই। সূর্য, বস্তু আর ছায়া। বস্তু না হলে ছায়া কি! এদিকে বলছো God real আবার Creation unreal! Creation-ও real।

প্রতাপ -- আচ্ছা, আরশিতে যেমন প্রতিবিম্ব, তেমনি মনরূপ আরশিতে এই জগৎ দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার -- একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিম্ব?

নরেন -- কেন, ঈশ্বর বস্তু। [ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন]

[*জগৎ-চৈতন্য ও Science -- ঈশ্বরই কর্তা*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) -- একটা কথা তুমি বেশ বলেছো। ভাবাবস্থা যে মনের যোগে হয় এটি আর কেউ বলেনি। তুমিই বলেছো।

---

[১] cf. Shelley's Skylark

“শিবনাথ বলেছিল, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়। বলে জগৎ-চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হয়। বোধস্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে, তাঁকে চিন্তা করে অবোধ!

“আর তোমার Science -- এটা মিশলে ওটা হয়; ওটা মিশলে এটা হয়; ওগুলো চিন্তা করলে বরং বোধশূন্য হতে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে!”

ডাক্তার -- ওতে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মণি -- তবে মানুষে আরও স্পষ্ট দেখা যায়। আর মহাপুরুষে আরও বেশি দেখা যায়। মহাপুরুষে বেশি প্রকাশ।

ডাক্তার -- হাঁ, মানুষেতে বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্য জড় পর্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত-পা-শরীর নড়ছে! বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন, জানে না। বলে, জলে হাত পুড়ে গেল! জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতর যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল!

“হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আলু-বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে আলু-বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে, নিচে আগুন আছে! মানুষ বলে, ইন্দ্রিয়েরা আপনা-আপনি কাজ করছে! ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে তা ভাবে না!”

ডাক্তার সরকার গাত্রোত্থান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার -- বিপদে মধুসূদন। সাধে ‘তুঁহু তুঁহু’ বলায়। গলায় ওইটি হয়েছে তাই। তুমি নিজে যেমন বলো, এখন ধুনুরীর হাতে পড়েছো, ধুনুরীকে বলো। তোমারই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কি আর বলব।

ডাক্তার -- কেন বলবে না? তাঁর কোলে রয়েছি, কোলে হাগছি আর ব্যায়রাম হলে তাঁকে বলব না তবে কাকে বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ঠিক ঠিক। এক-একবার বলি। তা -- হয় না।

ডাক্তার -- আর বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- একজন মুসলমান নমাজ করতে করতে ‘হো আল্লা’ ‘হো আল্লা’ বলে চিৎকার করে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাকছিস তা অতো চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান!

[*যোগীর লক্ষণ -- যোগী অন্তর্মুখ -- বিল্বমঙ্গল ঠাকুর*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

“কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে এক ভক্তের (বিশ্বমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে যেত। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়িতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরি হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে বলে হাতে করে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোন্‌খান দিয়ে যাচ্ছে, এ-সব কিছু হুঁশ নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুজে ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছিল, তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ করে বলে উঠল, ‘কি তুই দেখতে পাচ্ছিস না? আমি ঈশ্বরকে চিন্তা করছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস?’ তখন সে লোকটি বললে, আমায় মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার হুঁশ নাই, আর আপনি ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছেন, আপনার সব বাহিরের হুঁশ আছে! এ কিরকম ঈশ্বরচিন্তা! সে ভক্ত শেষে সংসারত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে বলেছিল, তুমি আমার গুরু, তুমিই শিখিয়েছ কিরকম ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়। বেশ্যাকে মা বলে ত্যাগ করেছিল।”

ডাক্তার -- এ তান্ত্রিক উপাসনা। জননী রমনী।

[*লোকশিক্ষা দিবার সংসারীর অনধিকার*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- দেখ, একটা গল্প শোন। একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনত। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলত, রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলত, তুমি আগে বোঝ! ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন! আমি রোজ এত করে বোঝাই আর রাজা উলটে বলে, তুমি আগে বোঝ! পণ্ডিতটি সাধন-ভজন করত। কিছুদিন পরে তাঁর হুঁশ হল যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব -- গৃহ পরিবার, ধন, জন, মানসম্ভ্রম সব অবস্তু। সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসারত্যাগ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে, রাজাকে বলো যে এখন আমি বুঝেছি।

“আর একটি গল্প শোন। একজনের একটি ভাগবতের পণ্ডিত দরকার হয়েছিল, -- পণ্ডিত এসে রোজ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলবে। এখন ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটি লোক এসে বললে, মহাশয়, একটি উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিত পেয়েছি। সে বললে, তবে বেশ হয়েছে, -- তাঁকে আন। লোকটি বললে, একটু কিন্তু গোল আছে। তার কয়খানা লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে -- তাদের নিয়ে সমস্ত দিন থাকতে হয়, চাষ দেখতে হয়, একটুও অবসর নাই। তখন যার ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার সে বললে ওহে, যার লাঙ্গল আর হেলে গরু আছে, এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাচ্ছি না, -- আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে, আর আমাকে হরিকথা শুনাতে পারেন। (ডাক্তারের প্রতি) বুঝলে?”

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

[*শুধু পাণ্ডিত্য ও ডাক্তার*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কি জানো, শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পন্ডিতেরা অনেক জানে-শোনে -- বেদ, পুরাণ, তন্ত্র। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক-বৈরাগ্য চাই। বিবেক-বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা

সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে!

“গীতা পড়লে কি হয়? দশবার ‘গীতা গীতা’ বললে যা হয়। ‘গীতা গীতা’ বলতে বলতে ‘ত্যাগী’ হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যা ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। ‘ত্যাগী’ বলতে পারলেই হল।”

ডাক্তার -- ‘ত্যাগী’ বলতে গেলেই একটা য-ফলা আনতে হয়।

মণি -- তা য-ফলা না আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনেটিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলেছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্‌ ধাতু ঘঙ্‌ ‘তাগ’ হয়, তার উত্তর ইন্‌ প্রত্যয় করলে ত্যাগী হয়, ত্যাগী ও তাগী এক মানে।

ডাক্তার -- আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বললে, রাধা মানে কি জানো? কথাটা উল্‌টে নাও অর্থাৎ ‘ধারা, ধারা’। (সকলের হাস্য)

(সহাস্যে) - “আজ ‘ধারা’ পর্যন্তই রহিল।”